কোয়ান্টাম মেথড-৬

বেদ-বাইবেলের প্রচার ?

মুফতী শরীফুল আ'জম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল নবী রাসূল ও সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিশ্বাসের অন্যতম। নিজ নিজ যামানায় তাঁরা সকলেই অনুসরণীয় ছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা যে সকল বিধিবিধান প্রচার করেছেন, তা পালন ওই যুগে আবশ্যক ছিল। সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন এসে পূর্বের সকল কিতাবসমূহকে রহিত করে দিয়েছে। সর্ব শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ হয় এই কুরআনুল কারীম। কেয়ামত অবদি তাঁর শরীয়ত পালন গোটা মানব জাতির সুখ-শান্তি ও সফলতার জন্য আবশ্যক। প্রতিটি নবজাতক তাঁরই উম্মত ও কুরআনের অনুসারী হিসেবে ভূমিষ্ট হয়। যদিও মাতা পিতা পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান বা ইহুদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

একজন মুসলমান পূর্বের সকল নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থসমূহের স্বীকৃতি প্রদানকে নিজের ঈমানের অংশ মনে করে থাকে। মুসলমানদের এই ধর্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে কুরআন পাকের এই নির্দেশনা। "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎসমুদয়ের প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। (সূরা আল-বাকারা- ১৩৬)

পক্ষান্তরে ইহুদী-খ্রীস্টানগণ নিজেদের ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করতে চায় না। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) ও সর্বশেষ ঐশী কিতাব পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে চায় না। যা তাদের হঠকারীতা ও হীনমন্যতার পরিচায়ক।

অথচ শেষ নবীর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদী-খ্রীস্টানগণ অধির আগ্রহের সাথে তাঁর পথপানে তাকিয়ে ছিল। শেষ নবীর আগমণ সংক্রান্ত তাওরাত- ইঞ্জীলের ভাবিষ্যদ্বাণী পড়েই মূলত তাদের মধ্যে এই ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল। ইহুদীরা কাফের পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে এই প্রার্থনা করতো "হে আল্লাহ শেষ জামানার নবী ও তার উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হবে তার উসিলায় কাফেরদের উপর আমাদের বিজিত করো।" আর যখন শেষ জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) এর আগমণ ঘটল এবং তারা সকল লক্ষণ দেখে তাঁকে চিনতে পারল তখন শুধু মাত্র স্বগোত্রীয় না হওয়ায় তাদের মনপূত হলো না এবং অস্বীকার করে বসল। ফলে তারা অভিশপ্ত হলো।

পবিত্র কুরআনে তাদের এমন অপেক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

"এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহর তরফ হতে তাদের ধর্মগ্রন্থ (তাওরাত) এর সমর্থনকারী কিতাব (কুরআন) পৌঁছল অথচ ইতঃপূর্বে তারা কাফেরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করত। কিন্তু যখন তাদের চেনা জানা বস্তু অর্থাৎ কুরআন তাদের নিকট পৌঁছল তখন তা অমান্য করে বসল। সুতরাং অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" (সূরা আল-বাকারা ৮৯)

তারা শুধু ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং সত্য ধর্ম ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদীলবি ও খ্রীস্টান মিশনারী বিভিন্ন ছলে-বলে, কলাকৌশলে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের এলিট শ্রেণী থেকে একেবারে মঙ্গাপীড়িত মানুষ পর্যন্ত তাদের টার্গেটে পরিণত হচেছ। মুসলমানদের খ্রীস্টান ধর্মে দিক্ষিত করাই যেন তাদের কাছে মহা পূণ্যের কাজ। পবিত্র কুরআনে তাদের এই মনোভাবকে এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে–

"ইহুদী ও খ্রীস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।" (সূরা আল-বাকারা ১২০)

তাদের এই অপকর্মে নতুন সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড। খ্রীস্টান মিশনারীদের যে কাজ করতে অনেক বেগ পেতে হতো, কোয়ান্টাম তা অনায়াশেই করে যাচ্ছে। মুসলমানদের হাতে হাতে বাইবেলের বাণী পৌঁছানো সহজ হয়েছে কোয়ান্টামের আশির্বাদে। কোয়ান্টাম

কনিকা গ্রন্থের ২৮৫-২৯২পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে বাইবেলের মর্মবাণী। কোয়ান্টামের দাবী হলো তাদের কর্মকাণ্ডে ইসলাম বিরোধী কোনো বিষয় নেই। অথচ খোদ বাইবেলের প্রচার একটি ইসলাম বিরোধী কাজ। ইসলামের দৃষ্টিতে বাইবেল চর্চা এর প্রচার প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাওরাত ইঞ্জিল প্রকৃত পক্ষে বর্তমানের এই বাইবেল নয়। এ মহাসত্যকে অনুধাবনের জন্য ইতিহাস ও কুরআন হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

☆ বাইবেল (Bible) শব্দটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষা হতে নেওয়া হয়েছে। যা মূলত গ্রীক ভাষা থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ গ্রন্থসমূহের সংকলন। ল্যাটিন ভাষার শব্দটি একবচন স্ত্রী লিঙ্গ। এভাবে শব্দটি ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে গ্রীকভাষা হতে ইংরেজী ভাষায় প্রবেশ করেছে। এটা ঐশী বাণী সমূহের সংকলন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৩ আগস্ট ১৯৮৭)

বাইবেলের গ্রন্থসমূহ প্রথমত: দুভাগে বিভক্ত। (ক) ওই সমস্ত গ্রন্থ যা খ্রীস্টানদের মতে হযরত ঈসা আ. এর পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের কাছে এসেছে। (খ) ওই সমস্ত গ্রন্থ যা হযরত ঈসা (আ.) এর পর এলহাম তথা ঐশী অনুপ্রেরণার মাধ্যমে লেখা হয়েছে। প্রথম প্রকারকে পুরাতন নিয়ম (old testament) বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারকে নব বিধান (New testament) বলা হয়। উভয়ের সমন্বয় হচেছ বাইবেল। old testament পুরতান নিয়মের মাঝে ৪৭টি গ্রন্থ রয়েছে। যার প্রথম পাঁচটির সমষ্টির (পঞ্চগ্রন্থ) নাম হচেছ 'তাওরাত'। New testament নব বিধানের মাঝে স্থান পেয়েছে ২৭টি গ্রন্থ। তন্মধ্যে প্রধান চারটি গ্রন্থ হযরত ঈসা আ. এর চার জন শিষ্য মথি, মার্ক, লুক ও যোহন কর্তৃক রচিত। এই চারটি গ্রন্থকে ইঞ্জিল চতুষ্টয় বলা হয়। খ্রীস্টানদের নিকট ইঞ্জিল শব্দটি এই গ্রন্থ চারটিতে সীমাবদ্ধ। আবার কখনও রূপক অর্থে নিউ টেস্টামেন্টের সকল গ্রন্থকে ইঞ্জিল বলা হয়। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৩০৫-৩১৮)

হযরত ঈসা আ. এবং তাঁর সহচরদের বাইবেল ছিল আদী পুস্তক ওল্ড টেস্টামেন্ট। যতদূর জানা যায় হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর সহচরগণ তাদের জীবদ্দশায় আদী পুস্তককে নিজেদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। এ জন্য হযরত ঈসা আ. এর পর ২০ বছর পর্যন্ত কেউ নতুন গ্রন্থ সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেননি। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৩)

তাওরাত ও ইঞ্জিলের মাঝে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাওরাতের সম্পূরক হিসেবে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

"স্মরণ কর যখন মরিয়ম তনয় ঈসা আ. বলল হে বনি ইসরাঈল আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী।" (সূরা আসসাফ ৬)

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা আ. এর শরীয়ত যদিও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু তার অধিকাংশ বিধিবিধান মূসা আ. এর শরীয়ত ও তাওরাতের অনুরূপ। স্বল্প সংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র। (মা'আরেফুল কুরআন)

তাওরাতের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন :

তাওরাত ও ইহুদীদের অন্যান্য পবিত্র পদার্থসমূহ বাইতুল মুকাদ্দাসে রক্ষিত ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বাবেলিয়ান রাজ বুখতে নসর কর্তৃক ইহুদী রাজ্য আক্রমণ হওয়ার ফলে তাওরাত ইত্যাদিসহ বাইতুল মুকাদ্দাস অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় এবং সমস্ত ইহুদী নরনারী নিহত ও বন্দি হয়। এই ধ্বংসলীলার ফলে তাওরাত ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর খ্রীস্টপূর্ব ৫৩২ অব্দে পারস্য রাজের সাহায্যে বাইতুল মুকাদ্দাস পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ইসরা আজরা নামক এক ব্যক্তি কতগুলো কাগজ পত্র ইহুদীদের সামনে হাজির করে বলে এগুলোই হযরত মূসা আ. এর তাওরাত। এভাবে প্রথম পঞ্চগ্রন্থ সংকলিত হয়। নাহিমিয়া নামক এক ব্যক্তি আরোকতগুলো পুস্তক সংকলন করে তার সাথে সংযোজন করে দেয়।

খ্রীস্টপূর্ব ১৬৮ অব্দে ইন্তাকিয়ার রাজ এন্টিনিউস পূনরায় ইহুদীদের পরাভূত করে তাদের সকল ধর্মগ্রন্থগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলে এবং কঠোর আদেশ জারি করে যে, ইহুদী ধর্মগ্রন্থ কেউ মুখে মুখেও পাঠ করতে পারবে না। এর বহুদিন পর মাকাবী নামক দেশহিতৈষী এক ব্যক্তি এন্টিনিউসকে পরাজিত করে কতগুলো পুস্তিকা ইহুদীগণের সামনে উপস্থিত করে বলে এগুলোই ইসরা ও নাহিমিয়ার তাওরাত। সাথে আরো কিছু অংশ যোগ করে দেয়। ৭০ খ্রীস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর রোমান রাজ টাইটিউস জেরুজালেম অধিকার করে বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে ফেলে এবং বিজয় চিহ্ন স্বরূপ ইহুদীদের সকল ধর্মগ্রন্থ রোমীয় রাজধানীতে নিয়ে যায়। এভাবে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থগুলো পুন: পুন: বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হওয়ার ফলে সে যুগের ইহুদী পণ্ডিতগণ নিজেদের খেয়াল ও আবশ্যকতা অনুযায়ী পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে সেগুলোকে ধর্মগ্রন্থ বলে প্রচার করতে থাকে। আর প্রকৃত তাওরাত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাইবেলের প্রথম অংশ ওল্ড টেস্টামেন্ট এ স্থান পাওয়া তাওরাতের এটাই প্রকৃত অবস্থা।

ইঞ্জীলের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন :

নিউ টেস্টামেন্ট বা ইঞ্জীলের অবস্থা এর চেয়ে আরো শোচনীয়। সদুদ্দেশ্যে যত ইচ্ছা ধর্মশাস্ত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা খ্রীস্টানদের মতে বৈধ। খ্রীস্টান ধর্মের নেতা বিশব ইসোবিয়স বলেন "যাহা কিছু দ্বারা আমার ধর্মের গৌরব বাড়িতে পারে আমি তাহা সবই বাইবেলে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আর যাহা দ্বারা আমার ধর্মের ক্ষতি হইতে পারে আমি সেসকল গোপন করিয়া ফেলিয়াছি।" তার একথা দ্বারা সহজে অনুমান করা যায় যে, বাইবেলে কি পরিমাণ রদবদল করা হয়েছে।

খ্রীস্টীয় প্রথম যুগে ইঞ্জিলের সংখ্যা ছিল ৩৬টি এবং পত্র ছিল ১১৩টি। ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে রোম সম্রাট কনস্টানটাইন কর্তৃক আহূত ঐতিহাসিক নিসিও বা নিকিও কাউন্সিলে খ্রীস্টান পুরোহিতগণ বাইবেলের মধ্য হতে যাচাই বাছাই করে সন্দেহজনক পুস্তিকাসমূহ চিহ্নিত করেন। এবং সেগুলোকে বাইবেল থেকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেন। এই পরিত্যক্ত অংশকে ইংরেজী ভাষায় Apocryphal অর্থাৎ অপ্রামাণ্য অংশ হিসেবে অবিহিত করা হয়। উক্ত সভায় যে সকল ধর্ম বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল সেগুলো ভোটাধিক্য দ্বারা মিমাংশিত হয়েছিল। ঐশীগ্রন্থের যাচাই ভোটের মাধ্যমে করাটা কতবড় বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ হতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

৩৬৪ খ্রীস্টাব্দে এজাতীয় আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যা 'লোডেশিয়া' কাউন্সিল নামে প্রসিদ্ধ। এবার খ্রীস্টান পুরোহিতগণের সিদ্ধান্ত মতে পূর্বের বাইবেলের সাথে আরো ৭খানা পুস্তিকা সংযোগ করে দেওয়া হয়। তাদের যাচাই বাছাইয়ে এসকল পুস্তিকা ঐশীগ্রন্থ হিসেবে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ Revelation যা মূলত কিছু ভবিষ্যতবাণীর সমষ্টি, দ্বিতীয়বারের বাছাইতেও সন্দেহজনক ও অপ্রামাণ্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় বাদ পড়ে যায়।

৩৯৭ খ্রীস্টাব্দে এর চেয়ে আরো বড় ধরনের একটি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। যা 'কর্থিজ' কাউন্সিল নামে প্রসিদ্ধ। এতে খ্রীস্টজগতের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা অগেস্টাইনসহ ১২৬জন খ্রীস্টান পুরোহিত অংশগ্রহণ করেন। এতে পূর্বের বাইবেলের সাথে আরো ৭টি পুস্তিকা যোগ করা হয়। বাইবেলের মাঝে এসকল রদবদল যেহেতু ইসলাম আগমনের বহু পূর্ব থেকেই হতে থাকে তাই নবীজী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে যে বাইবেল ছিল তাও বিকৃত ও পরিবর্তিত ছিল।

১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত বাইবেল প্রচলিত ছিল। এরপর খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রোটেস্টান নামে নতুন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। যারা পূর্ববর্তী পুরোহিতদের সিদ্ধান্ত ভুল বলে দাবী করে বাইবেল থেকে অনেকগুলো গ্রন্থ বাদ দিয়ে দেয়। এভাবে প্রোটেস্টানদের বাইবেলের অধ্যায়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৬টিতে আর ক্যথলিক খ্রীস্টানদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা হলো ৭২টি। (বাইবেল সে কুরআন তক ১/৩১৯, ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৪)

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ক্যান্টরবরি নগরে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খ্রীস্টান পণ্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তে উপণীত হন যে, যে যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সেই যুগে এই শেকেলে বাইবেলের সংস্কার হওয়া আবশ্যক। সুতরাং সবার পক্ষ হতে এই কাজের জন্য ২৭জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১০ বছর পরিশ্রমের পর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে যুগোপযোগী বাইবেলের একটি নতুন সংস্করণ বের করেন। যা Revised Version নামে পরিচিত। (সমকালীন পরিবেশ ও জীবন ১৪৪-১৪৯)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) ইঞ্জিলের ইতিহাস আলোচনা করতঃ ঐতিহাসিক কালসমূহে এর পরিক্রমণের বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করেন, সেই অন্ধকার যুগে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ইঞ্জিল বিনষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে শুধু কিছু অংশ বাকী থাকে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল বিদ্যমান থাকারতো প্রশ্নই আসে না। কেননা তা এর শত শত বছর পূর্বেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ইঞ্জিলের বহু সংখ্যক সংকলন থেকে বাছাই করে চারটি ইঞ্জিলকে নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাজেই এই গ্রন্থগুলোকে আমরা সেই ইঞ্জিল বলতে পারি না, কুরআনের প্রতিটি স্থানে যাকে এক বচনে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যা হযরত ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। (ইসলামী বিশ্বকোষ ৩/৪১৭-৪১৮)

বাইবেলের বিকৃতি ও সংযোজন বিয়োজনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হলো। এছাড়াও যুগে যুগে আরো অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধনের ইতিহাস রয়েছে। বর্তমান বাইবেলের ভিত্তি যে, কত দূর্বল তা এসকল ইতিহাস থেকে সহজে অনুমান করা যায়। এধরনের বিকৃত গ্রন্থ কখনও ঐশীবাণী হতে পারে কি না কোয়ান্টামের ভাইয়েরা একটু চিন্তা করে দেখুন।

কুরআনের আলোকে বাইবেলের মূল্যায়ন :

অতীত উম্মতের কর্মকাণ্ড জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে পবিত্র কুরআন। ঐতিহাসিক রেফারেন্সে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও কুরআন হাদীসের রেফারেন্সে বাইবেলের বিকৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে –

"নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল এই কিতাবের পূর্বে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং অবতীর্ণ করেছেন মিমাংসা।" (সূরা আলে ইমরান ৩-৪)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত তাওরাত ও ইঞ্জিল দ্বারা কি বর্তমানের বাইবেল উদ্দেশ্য? যে খানে রয়েছে বহু বিতর্কিত ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট নামে দু'টি অধ্যায়। যুগে যুগে যাতে করা হয়েছে বহু সংস্কার, বর্ধন-কর্তন। যার বিশুদ্ধতা নিয়ে খোদ খ্রীস্টজগত সন্দিহান। যার মূল ভাষা আজ বিলুপ্ত। খ্রীস্টানগণ যাকে মথি, মার্ক, লুক এবং জোহনের রচিত Gospel নামে অভিহিত করে থাকে?! কখনই তা হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে তাওরাত ইঞ্জিলের আলোচনা আছে, তবে তার উদ্দেশ্য এই ওল্ড/নিউ টেস্টামেন্ট নয়। বরং তাওরাত দ্বারা সেই মূল ঐশী গ্রন্থকে বুঝায় যা হযরত মূসা আ. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর ইঞ্জিল দ্বারা সেই মূল ঐশীগ্রন্থকে বুঝায় যা হযরত ঈসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হয়ে ছিল। ইহুদী খ্রীস্টানরা তাতে মনগড়া সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে মারাত্মক বিকৃতি সাধন করে।

বাইবেলের এই বিকৃতির ঘটনা মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানব জাতিকে অবহিত করে দিয়েছেন। এখানে পবিত্র কুরআন থেকে লিখিত ও মৌখিক বিকৃতির একটি করে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

ক. ইরশাদ হচ্ছে- "অতএব তাদের জন্য আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে...।" (সূরা আল-বাকারা ৭৯)

খ. "আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে যাতে তোমরা মনে করো যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত, অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই উপর মিথ্যারোপ করে।" (সূরা আলে ইমরান ৭৮)

আহলে কিতাবদের পক্ষ থেকে বিকৃতি সাধনের এই ছিল চিরাচরিত অবস্থা। ঐশী গ্রন্থের মাঝে নিজেদের তরফ থেকে কিছু কম বেশ করে এমন ভঙ্গিমায় তা পাঠ করত যেন অনবগত সাধারণ শ্রোতারা ধোঁকায় পড়ে যায়। এবং এগুলোকে ঐশী গ্রন্থের অংশ মনে করে নেয়। শুধু তাই নয় বরং আরো একধাপ এগিয়ে মৌখিক দাবীও করতো যে, এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ বাস্তব হলো ওই বিষয়গুলো কিতাবেও নেই আল্লাহর তরফ থেকেও অবতীর্ণ হয়নি। এমন বিকৃত গ্রন্থকে সমষ্টিগতভাবে ঐশী গ্রন্থ নয় বলে আখ্যা দেওয়া যায়। আজ বিশ্বব্যাপী বাইবেলের যে সংকলনগুলো রয়েছে তা পরস্পরে ব্যাপক বিরোধপূর্ণ। আর তাতে এমনসব উক্তি রয়েছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুতেই হতে পারে না। (শায়খুল হিন্দ, তরজমাতুল কুরআন পৃষ্ঠা ৭৭। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী (রহ.) রচিত ইযহারে হক্ব দেখা যেতে পারে)

হাদীসের আলোকে বাইবেলের মূল্যায়ন :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের কাছে আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করতো। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবীদের উক্তিকে সত্য-কিংবা মিথ্যা বলো না। তবে তোমরা বল আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে এবং তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে।"

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাব বুখারী শরীফের তিন স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীস নং ৪৪৮৫, ৭৩৬২ ও ৭৫৪২।

যেহেতু আহলে কিতাবদের উক্তির মাঝে সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে তাই উক্ত হাদীসে তাওরাত ইঞ্জিল সম্পর্কে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রীস্টানদের কোনো উক্তির ব্যাপারে মন্তব্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেন কোনো বিষয় বাস্তব সত্য হয়ে থাকলে তা অস্বীকার করা না হয় আর মিথ্যাকেও স্বীকার করা না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ তোমরা (ধর্মীয় বিষয়ে) কোনো কিছু জানতে চাইলে আহলে কিতাবদের কাছে কিভাবে জিজ্ঞেস কর? অথচ তোমাদের ঐশীগ্রন্থ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ করেছেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আল্লাহর বিধান, যাতে কোনো মিশ্রন নেই। অপর দিকে আল্লাহ পাক

তোমাদের বলে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা (ইহুদী-খ্রীস্টান) আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং বিকৃত করে ফেলেছে। তারা সামান্য অর্থের জন্য নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করে বলছে যে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ। তোমাদের ধর্মীয় এলেম কি তাদের কাছে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করতে বাঁধা দেয় না? আল্লাহর কসম আমি তাদের কোনো লোককে তোমাদের কাছে অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।" (বুখারী শরীফ ৭৫২৩, ৭৩৬৩)

এসকল হাদীস থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইহুদী-খ্রীস্টানদের কাছে ঐশী গ্রন্থ নামে যা কিছু রয়েছে তা নির্ভেজাল নয়। বরং ঐশী গ্রন্থের বিকৃত ও পরিবর্তিত রূপ মাত্র। যার সত্য মিথ্যা নিরুপণ করা দুষ্কর। তাই কুরআন সুন্নাহ থাকতে বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ আর বাইবেলের মর্মবাণী মুসলমানদের হাতে দিয়ে তা থেকে সফলতার সূত্র সন্ধানের আহবান কোয়ান্টামের জন্য বৈধ হচ্ছে না।

বাইবেল চর্চা :

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ বুখারী শরীফের একটি অনুচ্ছেদের শীর্ষে (তরজমাতুল বাব) একটি হাদীস অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন– "কিতাবীগণের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করো না।" (বুখারী শরীফ অধ্যায় ৯৬, অনুচ্ছেদ ২৫)

তবে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি এভাবে উল্লেখ রয়েছে।

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবেত আনসারী (রা.) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আহলে কিতাবদের (ধর্মীয় বিষয়ে) প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক। কেননা যারা স্বয়ং নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করেছে তারা তোমাদের হেদায়াতের পথ দেখাতে পারবে না। অন্যথায় তোমরা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে ফেলবে।"

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে অপর বর্ণনায় রয়েছে– "তোমরা আহলে কিতাবের কাছে (ধর্মীয়) কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না। কেননা যারা স্বয়ং পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের পথের দিশা দেখাতে পারবে না। অন্যথায় তোমরা কোনো সত্য বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ফেলবে বা ভ্রান্তকে সত্যায়ন করে ফেলবে।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক - ১৯২১২, অনুরূপ হাদীস মুসনাদে আহমদ ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ও মুসনাদে বাযযারে রয়েছে)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর কাছে এক ব্যক্তি কিছু উপঢৌকন পাঠালে তিনি বললেন, তার উপঢৌকন আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, সে নাকি পূর্ববর্তী কিতাবাদী নিয়ে গবেষণা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "এটাকি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়।" (আল মওসূআতুল ফিকহিয়্যা কুয়েত- ৩৪/১৮৪)

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, বাইবেলের অনুসারী ইহুদী খ্রীস্টানদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান লাভের আশা করা বা বাইবেল চর্চা করা এবং এর মর্মবাণী অনুধাবনের চেষ্টা বৈধ হতে পারে না।

বাইবেল লেখা ও পড়া :

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর ঘর মদীনা শরীফ থেকে ২/৩ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে হাজির হওয়ার পথে আহলে কিতাবদের কিছু বসতি ছিল। জ্ঞান পিপাসু হযরত উমর (রা.) কোনো কোনো সময় তাদের মজলিসে গিয়ে বসতেন। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা জানতে পেরে যারপর নাই অসন্তুষ্ট হলেন। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত এসংক্রান্ত একটি হাদীসে এসেছে– "একদা হযরত উমর (রা.) নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন আমরা ইহুদীদের কাছ থেকে তাদের (ধর্মীয়) অনেক কথা শুনি। যা আমদেরকে প্রীত করে। আপনি কি আমাদেরকে তা লিখে রাখার অনুমতি দেবেন? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা কি নিজেদের শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছো, যেমন ইহুদী-খ্রীস্টানরা করেছিলো? জেনে রাখ! আমি তোমাদের কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছি। যদি মূসা (আ.) নিজেও জীবিত থাকতেন আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো উপায় থাকত না। (মেশকাত ১৭৭, মুসনাদে আহমদ ১৫১৫৬, বায়হাকী ১৭৭)

এখানে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বাইবেলের মত গ্রন্থের মর্মবাণী লিখে সংরক্ষণের অনুমতি প্রার্থনার ফলে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধমকের সুরে বলে উঠলেন তোমরা অন্যদের ধর্মগ্রন্থ থেকে ইলম অর্জন করতে চাচ্ছ কেন? নিজের ধর্মের ব্যাপারে কি তোমরা সন্দিহান হয়ে পড়লে? যেভাবে ইহুদী-খ্রীস্টানরা ধর্মের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে ঐশী গ্রন্থ ছেড়ে, নবীর প্রকৃত শিক্ষা ত্যাগ করে, প্রবৃত্তি পূজারী অর্থলিপ্সু রাহেব ও পাদ্রীদের অনুসারী হয়ে পড়েছে। তোমরাও কি তাদের মত দ্বিধান্বিত হয়ে অন্য ধর্মের মোখাপেক্ষী হয়ে পড়েছ? অথচ আমার আনীত শরীয়ত এত স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ যে, আজ মূসা (আ.)ও যদি থাকতেন তবে তিনিও সকল কথা ও কাজে আমার

শরীয়তের অনুসারী হতেন। আর তোমরা কি না আমার উপস্থিতিতে তাঁর উম্মত তথা ইহুদীদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে চাও। এই কাজ তোমাদের জন্য কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। (মেরকাত ১/৪২৩, মাজাহেরে হক্ব ১/২১৮)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কঠোর ভাষায় হযরত উমর (রা.)কে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, অন্য ধর্মের গ্রন্থ লেখার অনুমতি চাওয়ার দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, তারা নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনীত শরীয়তকে অপূর্ণাঙ্গ বলে বিশ্বাস করে। তাই এত কঠোরভাবে বারণ করেছেন। (আত্তালীকুস সবীহ ১/১৩১)

অপর হাদীসে এসেছে, "হযরত উমর (রা.) একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জনৈক আহলে কিতাবের কাছ থেকে পাওয়া একটি পুস্তিকা নিয়ে হাজির হলেন, এবং তা পাঠ করতে লাগলেন, এতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কাছে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট শরীয়ত নিয়ে এসেছি। আহলে কিতাবদের কাছে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করো না। অন্যথায় তারা কোনো সত্য বিষয় তোমাদের কাছে পৌঁছালে তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ফেলবে অথবা ভ্রান্ত বিষয় পৌঁছালে সত্যায়ন করে ফেলবে। ওই সত্তার কসম যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ যদি মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন তবে তিনিও আমার অনুসরণে বাধ্য হতেন।" (মুসনাদে আহমদ ১৫১৬৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৬৯৪৯)

বিশ্ব বিখ্যাত ফতাওয়া গ্রন্থ ফতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে, "তাওরাত ইঞ্জিল দেখতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। চাই আমাদের কাছে তা ইহুদী খ্রীস্টানগণ বর্ণনা করুক বা তাদের মধ্য হতে ইসলামগ্রহণকারী কেউ বর্ণনা করুক।" (ফতাওয়ায়ে শামী ১/১৭৫, এইচ এম সাঈদ)

সার কথা হলো বাইবেল নিয়ে পড়াশোনা করা এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ। এ ধরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোয়ান্টাম মেথড বেদ বাইবেলে সফলতার সূত্র সন্ধানে ব্রতী হয়ে এদেশের সরলমনা ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণকে বোকা বানাতে সচেষ্ট রয়েছে।

বাইবেল প্রচার :

যেভাবে বাইবেলের চর্চা বা শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে পড়াশোনা নিষিদ্ধ তদ্রুপ বাইবেলের প্রচার বা মর্মবাণী বর্ণনা করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু নামলা আনসারী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশ দিয়ে জনৈক ইহুদী একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ! বলুন তো দেখি এই লাশ কি কথা বলতে পারে? নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহই ভাল জানেন। ইহুদী বলল, হ্যাঁ সে কথা বলতে পারে। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আহলে কিতাবগণ তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করে তা সত্যায়নও করোনা এবং মিথ্যা প্রতিপণ্যও করো না। বরং তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁর সকল রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। অতঃপর যদি তা ভ্রান্ত হয় তবে তার সত্যায়ন থেকে বেঁচে যাবে আর হক্ব হলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বেঁচে যাবে। (আবু দাউদ-৩৬৪৪)

এই হাদীস থেকে একথা প্রমাণ হলো যে, আহলে কিতাব তথা ইহুদী খ্রীস্টানদের ধর্মীয় বিষয় বর্ণনা করা বা প্রচার-প্রকাশ করা নিষেধ। যেহেতু তাদের সূত্রে বর্ণিত ধর্মবাণীর সত্যতা নিশ্চিতরূপে যাচাই সম্ভব নয়। উপরন্তু কুরআনে তাদের ধর্ম বিকৃতির স্বাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই ঈমানদারের কর্তব্য। আর সকল নবী রাসূল ও তাঁদের উপর অবতীর্ণ ঐশী বাণীর উপর শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তা বর্তমানের এই বাইবেল নয়। বিকৃত এই বাইবেলকে অনুসরণীয় মনে করা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনীত শরীয়তকে অর্ধাঙ্গ মনে করার শামিল। তাই বাইবেলের প্রচার প্রসার কোনো কিছুই শরীয়ত সম্মত নয়। কোয়ান্টামের বাইবেল কনিকাসহ ভিন্ন ধর্মের সকল প্রচারণা অবৈধ ও হারাম। এমন গর্হিত কাজকে ধর্মসম্মত বলা অজ্ঞতা না হলে অজ্ঞতার সংজ্ঞা নতুন করে নির্ণয় করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, কোয়ান্টাম কনিকায় যদিও বাইবেলের সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের বেদ, ও বৌদ্ধ ধর্মের ধম্মপদের মর্মবাণীও প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু তাওরাত ইঞ্জিলের মত ওই সকল গ্রন্থ ঐশী বাণী হওয়ার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই বিধায় তার আলোচনা পরিহার করা হলো।